মমতা

সৈয়দ আব্দুল মালিক

অনুবাদ ঃ বাসুদেব দাস

পাশাপাশি অনেকদিন বাস করার ফলে আর যেহেতু সমবয়সী হওয়ার জন্যই ক্যাপ্টেন বিবেকানন্দের সঙ্গে আমার গাঢ় বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল অবশ্য অনেক বিষয়ে আমাদের দুজনের মধ্যে পার্থক্যও ছিল। যেমন ও কথা বলে বড় আনন্দ পায়, একজন মনের মতো শ্রোতা পেলে খাওয়া দাওয়া ভুলে কথা বলে যেতে পারে কিন্তু আমি কথা খুব কম বলি --- আগে থেকেই। তাছাড়া অনর্গল কথাবলার মতো উপলক্ষ্যও আমার সবসময় থাকে না। ছেলেমেয়েদের সঙ্গেই সকাল বিকেল যা অল্প কথা বলি। ক্যাপ্টেনের মত শান্ত নির্ঝঞ্ঝাট। তাঁর ঘরে কেবলমাত্র দুটি ছেলেমেয়ে। ছেলেটি ঘরে থাকে না। এয়ারফোর্সে রয়েছে। ঘরে কেবলমাত্র ক্যাপ্টেন বিবেকানন্দ এবং মেয়ে সবিতা। মেয়েটিও বইপত্র, ম্যাগাজিন আর ভায়োলিন নিয়ে ব্যস্ত থাকে। সবিতা খুব সুন্দর ভায়োলিন বাজায়।

আমার ছেলেমেয়ে আটটি। ছোট একটি ভাতিজাও আমার সঙ্গে থাকে। তাছাড়া হাসপাতালের চৌকিদার এবং তার স্ত্রীও আমাদের ঘরের সঙ্গে থাকে। ফলে আমি যদিও কম কথা বলতে ভালোবাসি আমার ঘরে সব সময়ই হৈচৈ লেগে থাকে।

ভেটেরিনারি হাসপাতালের কম্পাউণ্ডটা বিশাল। কেস কম। শহরের মাঝখানে গো মহিষের হাসপাতাল খুললে কেস কম হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। তাই সারাদিনে তিন চারটি গো ছাগল দেখার। বাইরে আমার আর কোন কাজ থাকে না। তাছাড়া জন্তুর চিকিৎসা একতরফা। ডাক্তারের বিচার আর সিদ্ধান্তেই শেষ কথা। গো-মহিষ প্রতিবাদ করতে পারে না। আর গো মহিষের সাধারণতঃ একই ধরনের অসুখ হয়। মানুষের মতো জটিল অসুখ বিসুখ খুব কমই হয়। সেজন্যই আমার অর্বতমানে ফিল্ড অ্যাসিটেন্ট ব্যাধি দেখে ঔষধ দিতে পারে, দেয়ও। আমার মতো ভেটেরেনারি ডাক্তারের কাজটা খারাপ নয়। অবশ্য মানুষের ডাক্তারের মতো এতো পয়সা নেই। কিন্তু কাজটি খুব নির্ঝঞ্ঝাটের।

আমাদের হাসপাতালের পথটির ওপাশেই ক্যাপ্টেন বিবেকের ঘর। বয়সে সে আমার থেকে ছয় সাত বছরের বড়। তার বয়স ষাট বছরের কাছাকাছিই হবে। সবিতা এখন বাইশ বছরের।

দুটি মহাযুদ্ধেই ক্যাপ্টেন সৈন্য হিসেবে যুদ্ধ করেছিলেন। তারপর রেগুলার আর্মিতে। কিছুদিন কোন একটি সামরিক কলেজের শিক্ষক ছিলেন। বর্তমানে পেনশন নিয়ে এখানেই ঘরবাড়ি করে বসবাস করছেন।

এখন সৈন্য না হলেও সৈনিকের স্বভাব প্রায় সবগুলিই বজায় রয়েছে। ভোর পাঁচটায় উঠেন, দাড়ি কাটেন, স্নান করেন, অল্প চা পান করেন, তারপর ঠিক ছয়টার সময় সবিতার সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়ে যান। জোর বৃষ্টি না হলে এ নিয়মের কোন ব্যতিত্রম হয় না।

মানুষটি প্রায় ছয় ফুট লম্বা স্বাস্থ্যবান এবং সুন্দর। মুখ দেখলে তাঁর বয়স বিশ বছর কম ভাবতে কোন অসুবিধে নেই। সবিতার পাশে তাঁকে বড় ভাই বলে মনে হয়। ক্যাপ্টেনের সোনার ফ্রেমের পাতলা চশমা জোড়া, বাঁ হাতের দামী ঘড়িটা আর সর্বদা ইস্ত্রি করা জামা সবসময়ই নতুন বলে মনে হয়। কেবল মাত্র পরিবর্তন দেখা যায় টুপিটার ক্ষেত্রে। তিনি সাধারণত ঃ একটা খাকি টুপি পরে থাকেন। কিন্তু কখনও আবহাওয়া পরিস্কার থাকলে তিনি টুপি ছাড়াই বেড়াতে যান। অল্প টাক থাকা মাথাটি তাঁর শান্ত জীবনযাত্রার পরিচয় দান করে।

তাঁর এই সুশৃঙ্খল, পরিপাটি জীবনের তুলনায় আমার জীবন যথেষ্ট বেসুরো। সকালে উঠে বেড়ানোর অভ্যেস আমার নেই, অবশ্য আমিও তাড়াতাড়ি উঠি। কিন্তু ছেলেমেয়েদের সুশৃঙ্খল করতেই আটটা বেজে যায়। মার পক্ষে একা সম্ভব হয়ে উঠে না। তাছাড়া আটটা থেকে হাসপাতাল খুলতে হয়। বিকেলেও যখন ক্যাপ্টেন মেয়েকে নিয়ে সিনেমা দেখতে যায়, তখন আমি বাজার করতে যাই।

যেদিন ক্যাপ্টেন সিনেমায় যান না, সেদিন হয়তো তিনি সবিতার বেহালা শোনেন, নতুবা আমাদের ঘরে আসেন। আমার বড় মেয়ের সঙ্গে সবিতার খুব বন্ধুত্ব। তাই সবিতাকে ভিতরে পাঠিয়ে দিয়ে বিবেক আমার সঙ্গে আলোচনায় ব্যস্ত হয়ে উঠে।

জীবনের তিন ভাগের এক ভাগ ক্যাপ্টেন বিবেক ঘর থেকে দূরে, বাইরে কাটিয়েছে। সৈনিকের জীবন, তাঁর উপর রেগুল ারইনফেন্ট্রি। যুদ্ধক্ষেত্রে সবসময় প্রথম সারিতে থাকতে হত। জীবনের সঙ্গী বন্দুক আর বুট, ট্রেঞ্চ আর তাঁবু। সেই জীবনের সঙ্গে কম করেও বিশ বছরের সম্পর্ক।

কত দেশ দেখেছেন বিবেক। কত জায়গায় বেড়িয়েছেন। কত ধরনের মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে কত অভিজ্ঞতা, কত চেনাজানা আর যদি যে সমস্ত কথা বলার জন্য এই বৃদ্ধ বয়সে ক্যাপ্টেন বিবেক আগ্রহী হয়ে উঠে, তাতে অবাক হবার কিছু নেই।

ক্যাপ্টেন লোকটি যেমনটি পরিপাটি কথাবার্তায় তেমনই ধীর এবং সংযত। যুদ্ধক্ষেত্রের অত্যন্ত ভয়াবহ একেকটা পরিস্থিতির অভিজ্ঞতার কথা বলতেও তিনি বিন্দুমাত্র ধৈর্য হারান না। একটুও অতিরঞ্জনের চেষ্টা করেন না। এ জন্যই তাঁর কথাগুলো শুনতে আমার ভাল লাগে। তিনি যেন একজন ইতিহাসবিদ, চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন মানুষের জন্ম মৃত্যুর ইতিহাস, ...আর পুরনো দিনেরএপিক গায়কের মতো এক দিক থেকে বলে যান কথাগুলি।

যখনই আসেন তখনই তিনি আমাকে তাঁর দৈনিক জীবনের অভিজ্ঞতার কথা বলেন। একদিন তিনি বলছিলেন, ---অন্ধক ারের মধ্যে গুলি চালনায় আমার হাতে কত লোক মরেছে তার কোন সীমা সংখ্যা নেই। কিন্তু চোখের সামনে গুলিতে অ ার সঙ্গীন দিয়ে যাঁদের খুঁচিয়ে মেরেছি তাদের কথা আমার ভালভাবেই মনে রয়েছে।''

''আপনার হাতে আনুমানিক কতজনের মৃত্যু হয়েছে?

''দুশো একান্নটি। দুটি মহাযুদ্ধে আমার হাতে মোট দুশো একান্নটা মানুষ মরেছে, ডায়েরিতে আমি তারিখ এবং জায়গার কথা লিখে রেখেছি।''

''একজন মানুষকে খুন করার সময় খারাপ লাগে না কি?''

''সৈনিক হিসেবে একটুও খারাপ লাগে না, আনন্দই হয়, আর মারার বাইরে অন্য কোন পথও নেই। আমি না মারলে সে আমাকে গুলি করে মারবে। তাই যে বুদ্ধিমান, সে শত্রু সৈন্য দেখলে এক সেকেণ্ডও দেরি করবে না। প্রথমে যে গুলি করে, সেই রক্ষা 'পায়।,

''নিজের গুলিতে চোখের সামনে একটি মানুষকে ঢলে পড়তে দেখেও খারাপ লাগে না?''

''ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ দেখে না, দেখার সময় থাকে না। এগিয়ে যেতে তো হবেই। একবার জার্মানীর সামনে ছিলাম। হঠাৎ শত্রুরা আমাদের চারদিক থেকে ঘিরে ধরল। আর উপায় নেই, আমরা অবিরত গুলি চালাতে লাগলাম। শত্রুপক্ষের 'পেট্রোল' দেওয়া সৈন্য সংখ্যায় কম। সকলেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। শেষ সৈন্যটি ছিল প্রায় আঠার বছরের এক জ ার্মান যুবক। পেটে গুলি লাগায় সে চিৎ হয়ে পড়ল। আমি তার সামনে গেলাম। দেখলাম সে জীবিত রয়েছে। আমি সামনে থাকায় সে বড় কণভাবে ইংরেজিতে বলল--Do not kill me. I may Live."

''আপনি তখন কি করলেন?'' ''আমার বন্দুকের সামনে থাকা বেয়নেটটা তার বুকে জোরে ঢুকিয়ে দিলাম। কছুক্ষণ ধড়ফড় করে সে মরে গেল। তার চোখ দুটি এখনও আমার মনে পড়ে।

ক্যাপ্টেনের কিছু খামখেয়ালিপনা রয়েছে। তিনি কুকুর সহ্য করতে পারেন না। হারমোনিয়মের আওয়াজও তাঁর কাছে অসহ্য; লালরঙের কাপড় দেখলেই তাঁর মাথা গরম হয়ে যায়, বৃষ্টি তাঁর খুব প্রিয়। কিন্তু একনাগাড়ে দুদিন বৃষ্টি হলে তিনি কিছুটা ধৈর্যহারা হয়ে পড়েন।

কখনও কখনও তিনি আমার ছেলে মেয়েদের নিজের ঘরে ডেকে নেন এবং ঘরের পেছন দিকের উঠানে সব কয়টিকে দাঁড় করিয়ে রাখেন। তাদের হাসি পেলেও হাসতে ভয় করে। ক্যাপ্টেন সীরিয়াস।

কখনও বা আমাকে ডেকে পাঠান। তাঁর অভিজ্ঞতার ইতিহাস বলেন, আর কিছু ফোটো বার করে দেখান, কখনও বা ড ায়েরি পড়ে শোনান, লোমমহর্ষক, রোমাঞ্চকর কাহিনীতে পরিপূর্ণ তাঁর ডায়েরি।

একদিন মধ্যরাত্রি, আমাদের নিয়ে একটি দুর্গে প্রবেশ ক'রল, একটি পুরনো দুর্গ। ভেতরে একঘর মানুষ ছিল। আমাকে অ

ার হরিসিংকে একটি ছোট ঘরে বন্ধ করে রাখল। মনে হয় তাঁদের জেলখানা অল্প দূরে ছিল।
''ভোরবেলা একজন যুবতী মেয়ে আমাদের কুঠরির সামনে দিয়ে যাচ্ছিল। আমি তাকে ডাকলাম। সে তাকাল, আমি বললাম, 'আমার খুব পিপাসা পেয়েছে'। মেয়েটি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে ফিরে গিয়ে জগে করে এক জগ জল নিয়ে এল। জগটি বেশ বড়। রেলিঙের ফাঁক দিয়ে ঢোকে না। আমি তাকে দরজা খুলে দেবার জন্য অনুরোধ করলাম। দরজায় ব াইরে থেকে বল্টু লাগান রয়েছে। মেয়েটি কিছুক্ষণ কি যেন ভাবল। তারপর দরজাটি খুলে দিল। আমি বেরিয়ে এলাম, ত ার হাত থেকে জগটি নিয়ে জল খেলাম।
আরও একটা সিগারেট ধরিয়ে ক্যাপ্টেন পড়ে গেল--- ''তারপর জগটা ফিরিয়ে দিয়েই, সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটির গলা টিপে ধরলাম। মেয়েটি শব্দ করতে পারল না। কাঁপতে কাঁপতে পড়ে মরে গেল। আমি পালালাম। হরিসিংয়ের কথা জানি না।''
ক্যাপ্টেনকে নির্বিকারভাবে পড়ে যেতে দেখে আমার শরীরের লোমগুলি শিউরে উঠল।
আপনাকে জল দিয়েছে যে মেয়েটি তাকে কেন মেরে ফেললেন?''
''না হলে এখানে বসে আজকে আপনাকে আমার ডায়েরি পড়ে শোনাতে পারতাম না। যুদ্ধ বন্দীর একমাত্র কর্তব্য যে কে ান উপায়ে পলায়ন।
আমাদের দিনগুলি ভালভাবেই কেটে যাচ্ছিল। ক্যাপ্টেন থাকে তাঁর বিচিত্র অতীত নিয়ে। আমি থাকি জঞ্জাল ভরা বর্তমান নিয়ে। ক্যাপ্টেন লোকটিকে আমার বেশ ভাল লাগে।
একদিন আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ---'আপনি অনেক দেশ দেখেছেন, অনেক মৃত্যুও দেখেছেন, কোন ধরনের মৃত্যুকে আপনি বেশি ভয়াবহ বলে মনে করেন?''
একই রকম সরল গাম্ভীর্যের সঙ্গে তিনি বললেন ---'আমার দেখা প্রতিটি মৃত্যুই এক ধরনের, মৃত্যু জন্মের মতোই একটা নর্ম্যাল বায়োলজিক্যাল অ্যাফেয়ার। তাতে বিন্দুমাত্র বৈচিত্র নেই। তবুও ঘরে বসে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাওয় াটাকেই আমি সহচেয়ে ভয়াবহ বলে মনে করি।
তাঁর কথা শুনে আমি বেশ বিস্মিত হলাম। প্রতিটি মানুষই পরিবার পরিজনের মাঝখানে শান্তিতে মরতে চায়। ক্যাপ্টেন বলেন -- সে মৃত্যুই ভয়াবহ। আমি চুপচাপ থাকব ভেবেও জিজ্ঞেস করলাম---'' আপনি কেন এভাবে ভাবেন?'
ক্যাপ্টেন আরও সীরিয়স হয়ে বললেন-- একদল ছেলেমেয়ে চারদিক থেকে ঘিরে থাকলে, মানুষের স্বাভাবিক যে দুর্বলত া, তার জন্য মৃত্যুর সময় দুঃখ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু যেখানে সেখানে মৃত্যু খারাপ লাগে না। You simply die. Nothing more.
সেপ্টেম্বর মাসে বিবেক আর সবিতা দুজনেই চেঞ্জের জন্য সিমলা গিয়েছিল। প্রতি বছরেই যায়। মধ্যে মধ্যে কখনও কখনও তাঁর কথা মনে পড়ে। ইতিমধ্যে আমি আমার বড় মেয়ের বিয়ের প্রস্তুতিতে জড়িয়ে পড়লাম। আমার ছেলেমেয়েগুলি কিন্তু সবিতা এবং তার বাবার কথা প্রায়ই আলোচনা করে।
বড়দিনের সময়টা বোম্বাই কাটিয়ে ক্যাপ্টেন ঘুরে এল। আমাদের হাসপাতালের চৌকিদারের ঘরে একটি কুকুরের জন্ম হয়েছিল। মোটা মোটা বেশ কয়েকটি বাচ্চা। একদিন আমাদের বারান্দায় বসে থাকার সময় হঠাৎ ক্যাপ্টেন বিবেক 'কুকুরের বাচ্চাগুলিকেদেখতে পেল।
বলা যায় না তাঁর মনে কি ভাবনার উদয় হ'ল। চৌকিদারকে একটা রূপার টাকা দিয়ে তিনি কুকুরের বাচ্চাগুলিকে বা ড়িতে 'নিয়ে গেলেন। চৌকিদার নিজে বাড়িতে দিয়ে আসবে বলেছিল; কিন্তু তার জন্য অপেক্ষায় না থেকে তিনি নিজেই নিয়ে গেলেন। আমারা বিস্মিত হলাম!
তারপর থেকে দশদিন পর্য্যন্ত ক্যাপ্টেন বিবেকের আর কোন কাজ নেই। কুকুরের বাচ্চাগুলিকে খাওয়ায়, স্নান করায়, বেড়াতে নিয়ে যায়, ঘুম পাড়ায় আবার জাগিয়ে দেয়।
একদিন সবিতা এসেছিল, সবিতাই বলল, --বাবা এই কয়দিনকুকুরের বাচ্চানিয়ে এত ব্যস্ত, আমার খবর রাখাই ছেড়ে দিয়েছ। ''আমরা হাসলাম, বৃদ্ধ হলে মানুষ শিশুর মতো হয়ে যায়।
জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি সময়। বাইরে হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডা, রাত্রি তখন প্রায় সাড়ে এগারটা বাজে। আমরা নটার সময় শুয়েছি -- তখনও ঘুম আসেনি, হঠাৎ দরজার সামনে থেকে ক্যাপ্টেনের ডাক শোনা গেল, ---''ডাক্তার।''

আমি এক ডাকেই উঠে এলাম। বসার ঘরের দরজা খুলে বললাম, --আসুন।''
গম্ভীরভাবে ক্যাপ্টেন ঘরের ভেতর এল, তাঁর পরিধানে বিকেলের পোষাক, ছাড়েননি। আমি একটু উদ্বিগ্ন হলাম। ধীরভাবে তিনি বললেন -- পোশাক পনতো, আমার সঙ্গে একটু আসুন।'' আমি 'আলস্টার'টা পড়ে তাঁর সঙ্গে চললাম। ভয় হলো। কি জানি সবিতার কি হয়েছে। কিন্তু আমি গো মহিষের ডাক্তার, মানুষের নয়।
তাঁর সঙ্গে সঙ্গে পেছনে গিয়ে পৌছলাম। তিনি তাঁর শোবার ঘরের সামনের ছোট কুঠরিটা খুলে দিয়ে সুইচ টিপে লাইট জ্বালালেন। আমি দেখলাম।---পরিস্কার একটা মাদুরের উপর কুকুরের বাচ্চাগুলি। লাইট জলতে দেখে কুকুরের বাচ্চাদুটি চোখ তুলে আমাদের দিকে তাকাল। একটি বাচ্চা উঠে বসল। অপরটি শুয়েই থাকল।
ক্যাপ্টেন শুয়ে থাকা কুকুরটা দেখিয়ে আমাকে বলল -- এর কিছু একটা হয়েছে। আজ সকাল থেকে কিছুই খায়নি। দেখুন তো এর কি হয়েছে?''
আমি মোটামুটি হতভম্ব হয়ে গেলাম। কুকুরের বাচ্চাটির জন্য কি আমাকে রাত বারোটার সময় ঘুম থেকে উঠিয়ে নিয়ে আসছে?
আমি উল্টে পাল্টে কুকুরের বাচ্চাটিকে দেখলাম। জ্বর হয়েছে। বিশেষ করে গতরাতের ভীষণ ঠাণ্ডা পড়ায় আরো কাবু হয়ে পড়েছে।
আমি বললাম -- ''হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে একটু জ্বর হয়েছে।''
কিন্তু আমিতো ওর গায়ে গরম কাপড় দিয়েছিলাম?''
''বাচ্চাটা ছোট। এসময় ওর মায়ের শরীরের উত্তাপ ওর পক্ষে খুব প্রয়োজনীয়।''
''এখন তাহলে আপনি কি করতে চান?'' ক্যাপ্টেন জিজ্ঞেস করল''
''আমি একটা ঔষধ দিচ্ছি। সঙ্গে একটু সেঁক দিতে পারলে ভাল হয়।''
''তাহলে আসুন। আপনি ঔষধটা দিন, দেরি করবেন না। আমি আগুনের তাপে সেঁক দিচ্ছি।'
আমি একটা ঔষধ দিয়ে পাঠালাম। তাঁর নির্দেশানুসাবেই আমি আর গেলাম না। শুয়ে রইলাম।
পরদিন সকালবেলা হাসপাতালে যাবার সময় হঠাৎ আমার কুকুরের কথাটা মনে পড়ল। আমি তাঁর ঘরে গেলাম।
কুকুরের বাচ্চাটা শেষ রাতের দিকে মারা গেছে, কিন্তু ক্যাপ্টেনের অবস্থা তখন ভয়াবহ। তিনি সারা রাত আগুনের কাছে বসে কুকুরটাকে সেঁক দিয়েছেন। সারারাত বিছানায় যাননি। ঠাণ্ডায় তাঁর মুখ ক্ষ হয়ে উঠেছে। চায়ের টেবিলে বসে অন্য দিনের মতো সবিতাই কথা বলে যাচ্ছে। কিন্তু ক্যাপ্টেনের সেদিকে ভ্রুক্ষেপও নেই। মৃত কুকূরের বাচ্চাটা সামনে নিয়ে তিনি ছোট্ট শিশুর মতো বিমর্ষ হয়ে বসে রয়েছেন।
আমি একটু সমবেদনা জানালাম। তিনি বসা অবস্থাতেই চোখ দুটো তুলে আমার দিকে তাকালেন। দেখলাম তিনি কঁাদছেন। চোখদিয়ে দরদর করে জল গড়িয়ে পড়ছে।
''আপনি মন খারাপ করবেন না। ছোট বাচ্চা মরেই।'' ---আমি বললাম। ক্যাপ্টেন ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন। আমার দিকেতাকিয়ে বললেন ---'ডাক্তার আমি বহু মৃত্যু দেখেছি। কিন্তু মৃত্যু যে কি তা বোঝার কোনদিন অবসর পাইনি। ইস মৃত্যু কি কণ, কি দুঃখময়! কুকুরের বাচ্চাটি যে কি আশায় আর কি কণভাবে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল! মৃত্যুর সঙ্গে প্রকৃত পক্ষে আমি এই প্রথম মূখোমুখি হলাম। যতদিন পর্যন্ত নিজের প্রিয়জনের মৃত্যু না হয় ততদিন পর্যন্ত মৃত্যু যে কি তা আমরা বুঝতেই পারি না। আমি যে ওটাকেকি ভাল বাসতাম ডাক্তার।''
তাকিয়ে দেখি, ক্যাপ্টেনের চোখে জল। আমি বেশ অপ্রস্তুত। হাসপাতালে এসে পিয়নকে দিয়ে, কুকুরের বাচ্চাটাকে আনালাম। সঙ্গে ক্যাপ্টেনও এল। তিনি আমার ড্রইংমে, বসলেন।
আমি কথা খুঁজে পেলাম না।
ক্যাপ্টেন বিবেক বললেন -- ডাক্তার, মৃত্যুর সময় কুকুরের বাচ্চার চোখ দুটি মর্মান্তিকভাবে ট্রাজিক হয়ে উঠেছিল। ওর চোখদুটি আর সেই যুদ্ধে বেয়নেটে আমার খুঁচিয়ে মারার জার্মান যুবকের চোখ দুটি একেবারে এক, আশর্চ্য মিল।....
পরে সবিতা এসে বলেছিল সে কুকুরের বাচ্চাটির মৃত্যুশোকে ক্যাপ্টেন তিনদিন অন্নজল পান করেননি।
আমি বুঝতে পারছিলাম না। দুশো একান্ন জন মানুষের হত্যাকারী ক্যাপ্টেন বিবেকের হৃদয়ে একটি কুকুরের বাচ্চার মৃত্যু

এতটা প্রতিক্রিয়া কিভাবে সৃষ্টি করল।
হয়তো এরই নাম মমতা।